OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 617 - 626
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ত্রিপুরা রাজ্যের ঊনকোটি জেলায় প্রচলিত ধামাইল গানে প্রতিফলিত জনজীবন : একটি সমীক্ষা

কৃষাণ নমঃ
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাশহর, ঊনকোটি, ত্রিপুরা
Email ID : krishannamo1234@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Folk culture, Partition of India, Tripura, Folk songs, Dhamaail songs, Regionalism, Public life.

Abstract
Folk music is the most popular and widely circulated branch of Bengali folklore. It is difficult to determine the exact number of years since the creation of folk music. Since the dawn of civilization, music has been intricately connected with human life. Music serves as the only refuge for joy, sorrow, and anguish. Like classical music, melody is the main attraction and source of pleasure in folk music. "Folk music" primarily originates from rural life. It carries the essence, fragrance, and true nature of the common people. This music is deeply infused with the traditions, beliefs, and religious practices of rural life, reflecting various colors and aromas of folk culture. Most importantly, the language of folk music is highly regional.

During the Partition of India and the Liberation War, countless people were forced to leave their ancestral homes and move to West Bengal, Tripura, and Assam. These displaced individuals could bring nothing with them except their culture. Literature serves as a mirror of society, and accordingly, the impact of Partition has been meticulously reflected in Bengali literature. Due to this displacement, the refugees who migrated to these regions gradually blended their culture with that of the native population through long-term coexistence. The songs, rhymes, stories, rituals, dramas, proverbs, and sayings brought by the people from East Bengal merged seamlessly with the cultural fabric of both Bengals.

Folk music is dominated by the melody of Bhatiyali. Just as different regions develop their unique characteristics based on natural surroundings, folk music in this country has also evolved by embracing nature. The landscape of Bangladesh is not uniform everywhere—some areas are barren and rocky, some have undulating terrain, some face drought, while others suffer from river erosion. Due to these regional differences, folk music has not attained a universal form but has instead developed distinctive regional variations. For instance, Bhawaiya in the northern part of the country, Bhatiyali in the eastern region, and Baul songs in the southwestern part are prominent examples.

Additionally, the rivers in different regions of Bangladesh have distinct characteristics. For example, the nature of the Padma, Meghna, Surma, and Dhaleshwari rivers is different from that of the Madhumati, Ichamati, and Bhairab rivers. Consequently, the bond between people and rivers varies across regions. As a result, the creation and evolution of folk music in different regions take on unique dimensions, distinct from one another.

Discussion

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Folklore'। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'Folklore' শব্দটির জন্ম হয়। তার একশো বছরের কিছু সময় পরে ম্যারিয়া লিচ্ (Maria Leach) তাঁর S.D.F.M.L (সংক্ষেপে) অর্থাৎ 'Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ২১ জন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি বিদের দেওয়া সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম সংজ্ঞা কার জোনাস বালি (Jonas Balys) লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন -

> "Folklore comprises traditional creations of peoples primitive and civilised. They are achived by using sounds and words in metric form and prose, and include also Folk beliefs or superstitions, customs and performances, dances and places."[১]

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন –

> "লোকসাহিত্য নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত যে সমাজ, কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাব মুক্ত, সেই সমাজের সামগ্রিক জীবনবোধ ও মানসিকতার দ্বারা রচিত। স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবই সেই সাহিত্যের মুখ্য উপাদান।"[২]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণ কুমার চক্রবর্তী লোকসাহিত্য বিষয়ে বলতে চেয়েছেন, লোকসাহিত্য নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত এবং কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত। স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ-সরল-অনাড়ম্ভ ভাবই লোকসাহিত্যের মুখ্য উপাদান। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার বলেছেন -

> "লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝেছি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী কৌম সমাজে তার জন্ম।"[৩]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার অনাগরিক সংস্কৃতিকেই বুঝিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ অনাগরিক পরিবেশেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা হল -

> "অর্থ-সামাজিক জীবন প্রবাহ ও সমাজ সংগঠনের পটভূমিকায় সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময় বিকাশ তার বিশিষ্টরূপ লোকসংস্কৃতি।"[৪]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় অর্থ-সামাজিক জীবন ও সমাজ সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলির উপর ভিত্তি করে লোকসংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল -

১. লোকসংস্কৃতি বলয়ের অন্তর্গত জনগণকে ঐতিহ্য নির্ভর সাধারণ সংস্কৃতি পালন করতে দেখা যায়।
২. লোকসাধারণ প্রায় একই প্রকার বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করেন।
৩. সংস্কৃতির এই বৃত্তে সমাজ স্বরূপের সংহতিময় অবস্থান ও সমভাবাপন্ন সংহতি বোধ রয়েছে।
৪. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে একটি সংস্কৃতির বৃত্ত গড়ে উঠে।

৫. লোক ও সংস্কৃতির বলয়ে বসবাসকারী মানুষের আর্থিক পরিকাঠামো সামাজিক মানদন্ড প্রভৃতি প্রায় একই রকমের, প্রভৃতি।

বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত জীবন শাখা হল লোকসংগীত। আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে এই লোকসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। সভ্যতা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই সঙ্গীত মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। সংগীতই মনের আনন্দ দুঃখ বেদনার একমাত্র অবলম্বন। উচ্চ সংগীতের মতো সুরই লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ। 'লোকসংগীত' মুখ্যত গ্রাম্য লোকজীবন থেকে উদ্ভূত। এই গানে প্রকৃত মানুষের রূপ-রস-গন্ধ বর্তমান। এই গানে নিবিড় ভাবে মিশে আছে গ্রাম্য জীবনের লোকাচার-বিশ্বাস-ধর্ম ইত্যাদির নানা বর্ণ ও গন্ধ। সর্বোপরি এই গানের ভাষা অত্যন্ত আঞ্চলিক।

লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য। বিভিন্ন দেশে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তেমনি ভাবে লোক সঙ্গীত এ দেশে প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি সব অঞ্চলে একরকম নয় – কোথাও দেখা যায় অনুর্বর প্রস্তর ভূমি, কোথাও দেখা যায় তরাই অঞ্চল, কোথাও দেখা যায় মঙ্গা অঞ্চল, কোথাও দেখা যায় নদী ভাঙ্গন অঞ্চল। এই সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলের কারণে লোকসঙ্গীতের সুর সার্বজনীন রূপ লাভ না করে আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। যেমন - উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি, দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের বাউল মারফতি ইত্যাদি। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত নদনদী রয়েছে তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, যেমন - পদ্মা–মেঘনা সুরমা ও ধলেশ্বরী যেরূপ সেই রূপ মধুমতি, ইছামতী, ভৈরব প্রভৃতির সাথে মিলে না। তাই দেখা যায় নদ-নদীর সঙ্গেও জন মানুষের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় সেই যোগসূত্র সবজায়গাই একরকম না, একেক অঞ্চলে একেক রকম হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সেই অঞ্চলের লোকসংগীত এর সৃষ্টি এবং বিকাশ অন্য অঞ্চলের সাথে ভিন্ন মাত্রা দেখা যায়।

যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ যে সংস্কৃতি লালন করে আসছে সাধারণ অর্থে তাই লোকসংস্কৃতি। ঐতিহ্যানুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবনযাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকেই সহজ ভাষায় লোকসংস্কৃতি বলা হয়। লোকসংস্কৃতির আলোচনায় 'লোক' বলতে কোন একজন মানুষকে বোঝায় না। বোঝায় এমন একজন মানুষকে, যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা। আর 'সংস্কৃতি' হল সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ জীবন চর্যার। সংস্কৃতি অনুশীলন নির্ভর, কালপরম্পরায় বহমান, ক্রম পরিবর্তনশীল। তাই বলা যায়, লোকসংস্কৃতি হল যাতে লোকসমাজের সভ্যতা জনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে, লোকসমাজের জীবনচর্যার উন্নত রূপটি প্রকাশ পায়।

লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিমন্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে এর উদ্ভব। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লী বাসিরা স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর লালন পালন করেন। এগুলি মূলত ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়। এই জন্যই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয়-কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসংগীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, লোকছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ ও প্রবচন এই আটটি শাখায় ভাগ করা হয়।

লোকসংগীত ঐতিহ্যগত ভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গান। সাধারণত পল্লীর জনগণ এর প্রধান ধারক ও বাহক। বিষয়, কাল ও উপলক্ষ্য ভেদে এই গানের অবয়ব ছোট কিংবা বড় হয়। ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী আভোগ সম্বলিত দশ বারো জনের লোকসংগীত আছে। আবার ব্রত গান, মেয়েলি গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা গান ইত্যাদি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কবির লড়াই, আলকাপ গান, লেটো গান এবং যাত্রা গান হয় আরো দীর্ঘ, কারণ সারা রাত ধরে এগুলি পরিবেশিত হয়। লোকসংগীত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। লোকসঙ্গীতের বিপুল উৎস ত্রিপুরা রাজ্য। সংগীতের উৎপত্তি জুমকে কেন্দ্র করে। লোকগান নিত্যকালের গান। এই গানে আছে মানুষের প্রাণের ছোঁয়া, মাটির গন্ধ। এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ বেদনা, হাসি কান্না আর প্রেম ভালোবাসার কাহিনী লোকসংগীতের মূল বিষয়বস্তু।

গ্রাম্য জীবন প্রকৃতি আর সমর্পিত হৃদয়ের একটি আনন্দ ও অনির্দেশ্য বেদনা এই তিনটি উপাদান নিয়ে রচিত গানই হল লোকগান।

মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন কাশীপুরী লিখেছেন –

> "লোকসংগীত অপেক্ষা জনপ্রিয় সংগীত বাংলা সাহিত্যেই শুধু নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও নেই। কারণ লোক সংগীতে আছে গুণমনের অকপট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির আবেদন অত্যন্ত গভীর ও অত্যান্ত হৃদয় হৃদয়গ্রাহী। লোকসংগীতে আছে সরল স্বাভাবিক জীবনের মনোরম আলেখ্য আদর সোহাগের অনুপম মাধুর্য।"[৫]

উপরিক্ত সংজ্ঞাগুলির উপর ভিত্তি করে লোকো সংস্কৃতি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যেতে পারে–

১. মৌখিকভাবে লোকসমাজে প্রচারিত।
২. সম্মিলিত বা একক কণ্ঠে গাওয়া যেতে পারে।
৩. প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষের মুখে মুখে এর বিকাশ ঘটে।
৪. সাধারণত নিরক্ষর মানুষের রচনায় এবং সুরে এর প্রকাশ ঘটে।
৫. আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত হয়।
৬. প্রকৃতির প্রাধান্য বেশি।
৭. দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রকাশ পায়।
৮. গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন যাপন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
৯. স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সারল্য, বাহুল্য বর্জন, সর্বোপরি আন্তর্জাতিকতা লোকসংগীত এর প্রাণ।
১০. লোকসংগীতে আমরা সুর নয় কথারই প্রাধান্য দেখে থাকি।

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের লোকগান প্রচলিত রয়েছে। তেমনি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ও বিভিন্ন ধরনের লোকগানের প্রচলন দেখা যায়। যেমন - ধামাইল গান, সূর্য ব্রতের গান, অন্নপ্রাশনের গান, ভাইফোঁটার গান, চড়ক পূজার গান, দূর্গা পুজা কেন্দ্রিক লোকগান, মনসামঙ্গলের গান, পৌষ সংক্রান্তির গান, বৈষ্ণব সেবার গান, মণিপুরীদের লোকগান, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকগান প্রভৃতি।

ত্রিপুরা একটি পাহাড়ি রাজ্য। যার আয়তন ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিমি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে স্থান নেয়। বাংলাদেশের সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক মানুষ ত্রিপুরার উত্তর জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে। এইসব নাগরিকরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার সময় কোন কিছুই নিয়ে আসেননি, শুধু বয়ে এনেছিলেন নিজেদের সংস্কৃতিকে। আর সেই সূত্র ধরেই লোকসংস্কৃতির ধামাইল গানের ধারাটি ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলায় ধীরে ধীরে বনস্পতি রূপ ধারণ করে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'ধামাইল' শব্দটির যথার্থ উৎস আজ পর্যন্ত কোনো গবেষক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারেননি। তবে অনেকেই নানা ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে 'ধামালি', 'ধামান', 'ধামন', 'দামান', 'ধামলী' শব্দ থেকে ধামাইল গানের উৎপত্তি হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ (১৮৩৪-১৯১৬) এর হাত ধরেই ধামাইল গানের বিস্তৃতি ঘটে। এই জন্য রাধারমন দত্ত পুরকায়স্থকে 'ধামাইল' গানের জনক বলা হয়।

ধামাইল গান মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিয়ে উপলক্ষে আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও এই গানের পরিবেশনা দেখা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে 'ধামালী' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও রাধারমনের হাত ধরেই নৃত্যগীত হিসেবে ধামাইল গান শীর্ষক পরিবেশনার উদ্ভব হয়েছে। ধামাইল গান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ভারতের ত্রিপুরা, করিমগঞ্জ, শিলচর ইত্যাদি এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। 'ধামাইল' গানের মধ্যে আবার বিভিন্ন পর্ব রয়েছে। যেমন - বন্দনা, আসর, বাঁশি, জলভরা, গৌররূপ, শ্যামরূপ, বিচ্ছেদ, কোকিল সংবাদ, কুঞ্জ সাজানো, স্বপন, চন্দ্রার কুঞ্জ, মান ভাঙানো, মিলন, সাক্ষাৎ, খেদ, বিদায় প্রভৃতি।

'ধামাইল' গানের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যেমন -

- এইগান সমবেত সঙ্গীত আকারে পরিবেশন করা হয়।
- শিল্পীরা চক্রাকারে নৃত্যের আঙ্গিকে ঘুরে ছন্দময় করতালির মাধ্যমে এই গান গেয়ে থাকেন।
- গান গানের সময় কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু জায়গায় ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়।
- ধামাইল গানের শিল্পীরা তাদের ছন্দময় করতালির মাধ্যমে সুর-তাল-লয় এর সমন্বয় করে থাকেন।
- এই গানের গায়নরীতি ও অন্য গানের চেয়ে আলাদা। গানের শেষে লম্বা টানের রেশ পরিলক্ষিত হয়।

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় উত্তর জেলা ও উনকোটি জেলায় বহুল পরিমাণে ধামাইল গান ও নাচ প্রচলিত রয়েছে। কৈলাশহর, কুমারঘাট, কাঞ্চন বাড়ি, কাঞ্চনপুর, পেচারখল, ধর্মনগর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের জনজীবনের সাথে ধামাইল গান ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এইসব অঞ্চলের হিন্দু বাঙ্গালীদের সকল মানুষের যাবতীয় মঙ্গল কার্যের সময় ধামাইল গান গাওয়া হয়। ওই সব অঞ্চলে বাঙ্গালীদের বিয়ের আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিন বর ও কনের বাড়িতে ধামাইল গান ও নৃত্যের আসর জমে ওঠে। সন্ধ্যে থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত এই গানওনাচ চলতে থাকে। ধামাইল গান অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার আগে গৃহস্থ প্রথমে ধামাইল গান ও নৃত্য শিল্পীদের পান-সুপারি, ধূপ-দীপ, দুর্বা, ধ্বনি দিয়ে বরণ করেন। বরণ হওয়ার পর শিল্পীরা অনুষ্ঠান শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ের গানের মধ্য দিয়ে তারা ধামাইল গান ও নাচ সমাপ্ত করেন। ত্রিপুরার উত্তর জেলায় বহুল প্রচলিত কিছু ধামাইল গান ও জনজীবনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে নিজে নাতীদীর্ঘ আলোচনা করা হল।

বন্দনা

“আরে অয় গো,
পূর্বেতে বন্দনা করি পূর্ব দিবাকর
যে ভানু উদয় হইলে সয়াল অয় প্রহর।
উত্তরে বন্দনা করি উত্তম তীর্থস্থান
তেত্রিশ কোটি দেব গণে যাতে করুইন ধ্যান।
পশ্চিমে বন্দনা করি ক্ষেত্র জগন্নাথ
প্রসাদ বলিয়ারে বাজারে বিকায় ভাত।
ভাত বিকায় ব্যঞ্জন বিকায় আর বিকায় পিঠা
জগন্নাথের লাবরা ব্যঞ্জন খাইতে লাগে মিঠা।
চন্ডালেতে রান্দে ভাত ব্রাহ্মণে সে খায়
তথাপি নরলোকের জাতি নাহি যায়।
দক্ষিণের বন্দনা করি কালিদয় সাগর
চান্দ সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা তাতে অইল তল।
তল অইল চৌদ্দডিঙ্গা বাদের কারণ
সেই হণে মনসার পূজা সঞ্চয়ে ভুবন।
একে একে বন্দনা করিলাম সমাধান
আইজ রাইতে গাইবো মোরা অধিবাসের গান।”[৬]

ব্যাখা - এই গানটি অধিবাসের রাতে ধামাইল গান বা নাচ শুরু করার সময় একেবারে প্রথমে বন্দনা করে গাওয়া হয়। মধ্যযুগের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোতে একেবারে প্রথমেই বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দনা করা হয়েছে। তদনুরূপ ধামাইল গানের বন্দনা অংশেও বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দনা আমরা দেখতে পাই। আমরা এই গানটিতে সূর্যের বন্দনা পাই। যে সূর্যের আলোয় প্রতিটি রাতের পর একটি নতুন দিন আসে। প্রকৃতি পূজার প্রবণতা ভারতীয়দের মধ্যে বৈদিক যুগ থেকে আজও বিদ্যমান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই গানটিতে হিমালয় পর্বতের বন্দনায় আমরা পাই। একে একে আমরা এই গানটিতে জগন্নাথ এবং শিব কন্যা মনসা এইসব দেব-দেবীদের বন্দনাও পাই। এই এই গানটি কবে রচিত হয়েছিল সে কথা আমরা জানি না, বা গানটি কার রচিত তাও আমাদের অজানা। যুগের পর যুগ ধরে এই সব গান লোকমুখে প্রচলিত এবং প্রবাহিত হয়ে আসছে। আমরা বাংলার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে বাংলা একসময় বর্ণভেদ, জাতিভেদ এইসব কুপ্রথা বলা যায় কুসংস্কার চরম রূপ নিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের ছায়া স্পর্শ করতেন না তাদের। তাদের ছোঁয়া কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। সমাজের অন্তজ শ্রেণীর মানুষরা যেমন - চন্ডাল, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি জাতির লোকদের গ্রামের বাইরে থাকতে হতো। কেননা সমাজের মাথা ব্রাহ্মণদের মতানুসারে এদের ছায়া স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণদের জাত যায়, তাদের নরকবাস হয়। কিন্তু এই গানটির একটি পংক্তিতে আমরা দেখতে পাই যে গানটির রচয়িতা জাতিভেদের এই কুপ্রথার কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন -

“চন্ডালেতে রান্দে ভাত ব্রাহ্মণে সে খায়।
তথাপি নরলোকের জাতি নাহি যায়।।”

এই গানটি আজও সমমর্যাদায় ধামাইল গানের সময় প্রথমেই গাওয়া হয়। উত্তর ত্রিপুরার প্রতিটি হিন্দু বাঙালিরা বিয়ের সময় এই গানটি গেয়ে থাকেন। বিয়ের মতো শুভ অনুষ্ঠানে দেবদেবী ও প্রকৃতির বন্দনামূলক এই গানটি আজও খুব প্রাসঙ্গিক।

আসর

“আমি ডাকি কাতরে,
আইসো গৌর নিত্যানন্দ এই আসরে।
তোমায় আসন দিয়া বসাইব হৃদয় মন্দিরে,
ভক্তগণ সঙ্গে করি, একবার আইস দয়াল হরি
তোমায় আসন দিয়া বসাইবো হৃদয় মন্দিরে।
তোমার যন্ত্র তুমিগো ধর, গৌর তোমার কীর্তন তুমি করো,
তুমি না বাজাইলে দেহযন্ত্র বাজবে কেমনে।
সুরেন্দ্রমোহন গো বলে, গৌড় আমার দয়া না করিলে
তোমার পতিতপাবন কে পাইবে জগত সংসারে।
তোমায় আসন দিয়া বসাইবো হৃদয় মন্দিরে।”[৭]

ব্যাখা - এই ধামাইল গানটি বন্দনার পর আসর সাজানোর সময় গাওয়া হয়। আসর পর্যায়ের এই গানে ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সম্মিলিত অবতার শ্রী চৈতন্যদেবকে আহবান করা হয়। শ্রী চৈতন্যদেবকে ভক্তের হৃদয়ে আসন পেতে বসানোর কথা বলা হয়েছে। গৌরাঙ্গকে বলা হয়েছে তাঁর বাদ্যযন্ত্র যেন তিনি ধরেন এবং তিনিই যেন কীর্তন করেন। আমাদের মনের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। আমরা এই জগতে যা করি সবকিছুই ঈশ্বর আমাদের দিয়ে করান। আমাদের জীবনের অদৃশ্য সুতো ঈশ্বরের হাতেই। তিনি যদি আমাদের দেহ যন্ত্রণা বাজান তাহলে আমাদের দেহ অচল হয়ে যাবে। এই গানটিতে আমরা একটি নাম পাই, যেটি হল সুরেন্দ্রমোহন। এই নাম দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এই গানটি সুরেন্দ্রমোহন নামে জনৈক ব্যক্তির রচনা। তিনি গৌড়ের প্রতি তার অগাধ আস্থাকে এই গানটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন গৌড় দয়া না করলে এই জগৎ সংসার থেকে, এই মায়া থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। তাই তিনি সুললিত কণ্ঠে গৌরাঙ্গ কে ডাকছেন তিনি যেন এই আসরে আসেন এবং আসন পেতে বসেন। আমরা এখনও একটি ভাবনাকে মানি যে জীবতকালে এই জগতে আমরা ঠিক যেমন কর্ম করব, পরকালে আমরা সেই সব কর্মই আবার ফেরত পাব।ভগবানের নাম ছাড়া এই জগত পার হওয়া যায় না। আসর পর্যায়ের এই গানে আমরা ভগবানের প্রতি অগাধ আস্থা কে ফুটে উঠতে দেখতে পাই। এই গানটি আজও সিলেটি বাঙালি বিবাহের আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিনরাতে আসর পর্যায়ের গান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617 - 626
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাওয়া হয়। বলাবাহুল্য শ্রীহরি সম্পর্কিত এ জাতীয় গান শুধুমাত্র বিবাহের ধামাইল এই নয়, হরিকীর্তন, বৈষ্ণব সেবার আসরেও শোনা যায়। এই গানটি শুধুমাত্র উত্তর ত্রিপুরার মানুষের জনজীবনে নয়, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের, বলা যায় বাংলার সকল মানুষের মধ্যেই এই গানের গভীর প্রভাব আজও বিদ্যমান।

বাঁশি

“বাঁশিরে, শ্যাম চান্দের বাসি করিলায় উদাসী।
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্দে থইলা কদম ডালে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে।
অষ্ট আঙুল বাঁশের বাঁশি তরল গাছের আগা।
তরে কে শিখাইলো বাঁশি আমার নামটি রাধা।
যেই ঝাড়ে থাক গো বাঁশি ঝাড়ের নাগাল পাইলে,
ঝাড়ে মূলে উগরিয়া সাগরে ফালাইতাম বাঁশি।
করিলায় উদাসী...”[৮]

ব্যাখা - উপরিউক্ত এই গানটি ‘বাঁশি’ পর্যায়ের গান। অধিবাসের সন্ধ্যায় আসর পর্যায়ের গানের পর বাঁশি পর্যায়ের এই গানগুলি দেওয়া হয়। এই গানটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধার মন উদাসীন হয়ে আছে। কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে সেটিকে কদম গাছের ডালে রাখল এবং বাতাসে বাশির সুর রাধা রাধা গুঞ্জন ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জানি বাঁশ গাছের কচি আগা দিয়ে বাঁশের বাঁশি তৈরি হয় এবং তাতে আটটি আঙ্গুল দিয়ে বাজানোর সুবিধা যুক্ত থাকে। শ্রীরাধা বাঁশিকে করছেন যে রাধার নাম বাঁশিটিকে কে শেখালো? কৃষ্ণ রাধার জন্য জলের ঘাটে বসে প্রতীক্ষা করছে এবং বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে আহবান করছে। রাধা বলছেন যে, যেই ঝাড়েই বাঁশিটি থাকুক না কেন রাধা যদি সেই ঝাড়ের নাগাল পান তাহলে সেই ঝাড়কে তিনি সমূলে উৎপাটন করে সাগরে ভাসিয়ে দেবেন। উপরিউক্ত ধামাইল গানে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার মনের অবস্থার যে চিত্র আমরা পাই তা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তখনকার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ও ‘বৈষ্ণব পদাবলী’তে ও সমরূপ উদাহরণ দেখতে পাই। প্রাকচৈতন্য যুগের কবি বড়ু চন্ডীদাস ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। এই কাব্যের অসংখ্য পদে আমরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধাকে উতলা হতে দেখতে পাই। তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল -

“কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশির শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।”[৯]

আমাদের আলোচ্য এই ধামাইল গানটিতে ‘কৃষ্ণকীর্তন’, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’র অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ এর প্রভাব পড়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। রাধা এবং কৃষ্ণ প্রাচীন যুগে যেমন বাঙালির মনে বিরাজমান ছিল আজও প্রতিটি বাঙালি তাদের হৃদয়ে রাধা-কৃষ্ণকে, তাদের প্রেমকে ধরে রেখেছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের প্রগাঢ়তা এই গানটির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। ত্রিপুরার উত্তর এবং ঊনকোটি জেলায় এই গানটি আজও বহুল প্রচলিত, প্রচারিত হয়ে আছে। আজো জনজীবনে এই সব গানগুলি প্রেমের সঞ্চার ঘটায়।

জলভরা

“আমরা ভরি গঙ্গার জল,
ঢেউ দিওনা ঢেউ দিওনা কলসি হবে তল।
পুষ্করিণীর চাইর ওপারে চম্পা নাগেশ্বর
পাতায় পাতায় লেখিয়া থইসে পিরিতের জ্বর।

কলসি ভরিয়া রাধে থইলা কদম তলে,
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে কলসি মাঝারে।
কদমফুল বাছিয়া রাধে নিরখিয়া চায়,
কালাচান্দের যুগল চরণ জলে দেখা যায়।
কলসি লইয়া রাধে বাড়িত চলিয়া আইলা,
কাঙ্খের কলসি ভূমে থইয়া জোয়োর ধ্বনি দিলা।"[১০]

ব্যাখা - এই গানটি 'জলভরা' পর্যায়ের গান। অধিবাসের দিন বর এবং কনেকে স্নান করানোর রীতি প্রচলিত আছে। সেই স্নানের জল ভরতে যাওয়ার সময় সকলে মিলে জলভরার এইসব গান গেয়ে থাকেন। এই গানটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীরাধা তাঁর সখীদের সাথে পুকুরে জল ভরতে গেছেন এবং তিনি কলসী ডুবার ভয়ে জলে ঢেউ দিতে মানা করছেন। পুকুরের চারিদিকে চাপা এবং নাগেশ্বর ফুল ফুটে রয়েছে এবং সেই গাছের পাতায় পাতায় কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রেমের বার্তা লিখে রেখেছেন। কলসীতে জল ভরে রাধা সেই কলসী কদম গাছের নিচে রেখেছেন। গাছ থেকে কদম ফুল ঝরে পড়ে সেই কলসী ভরে গেছে। রাধা কলসী থেকে কদম ফুল বেছে ভালোভাবে চেয়ে দেখছেন কলসীতে আর ফুল রয়েছে কিনা। রাধা তখন সেই কলসীতে কালাচাঁদ তথা শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগলকে দেখতে পান। অর্থাৎ সবই কৃষ্ণের লীলা। তারপর রাধা কলসী কাঁখে নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন এবং সেই কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে উলুধ্বনি দিলেন।

এই গানে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের তার প্রেমিকার প্রতি প্রেম নিবেদনের স্বরূপ জানতে পারি। প্রেম শ্বাশত। প্রাচীনকালে জনজীবনে প্রেমকে যে স্থানে রাখা হত, প্রেমকে যেরূপে মহিমামণ্ডিত করা হতো, বর্তমান যুগের একজন আদর্শ প্রেমিক ও প্রেমিকার কাছে প্রেম সেই সম্মানীয় স্থানেই অধিষ্ঠিত। এই গানে যেমন আমরা দেখি যে কৃষ্ণ চাপা এবং নাগেশ্বর ফুল গাছের পাতায় রাধার জন্য প্রেমবার্তা লিখে রেখে তার প্রেম নিবেদন করেছেন এ যুগে ও আমরা বিভিন্ন উপায়ে প্রেম নিবেদন করতে দেখতে পাই। গানটিতে শ্রীরাধাকে আমরা গৃহস্থবাড়ির কন্যা বা বধূ হিসেবে দেখতে পাই। জল নিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই রাধা পারিপার্শ্বিক সব বিষয় ছেড়ে সান্ধ্যকালীন দ্বীপদান ও উলুধ্বনি দিতে প্রবৃত্ত হলেন। এইখানে আমরা একজন আদর্শ বাঙালি বধূকেই পাই। আজও প্রতিটি বাঙালি মেয়ে বউরা সন্ধ্যায় তুলসী মঞ্চে বা ঠাকুরের সামনে দ্বীপ জালান এবং উলুধ্বনি দিয়ে থাকেন।

সবশেষে বলতে পারি যে এই গানটি বাঙালি জনজীবনে আজও সমাদৃত। রাধাকৃষ্ণ এবং তাদের সম্পর্কিত সকল গান ও কবিতাই বাঙালির হৃদয়ে যত্নশীল হয়ে আছে। বিয়ের আগের দিন এই গানটি গেয়ে আজও অধিবাসের স্নানের জল ভরা হয়।

নাম

"ছাড়রে সংসারের আশা, কৃষ্ণ নামে করো নিসা,
নামে করো নিসা রে মন, নামে করো নিসা।
না লইয়া কৃষ্ণ মন্ত্র, আগে করলায় বিয়া,
অতি সাধের সুন্দর নারী, ভবে যাইবায় থইয়া।
পূর্ণিমার চাঁদ থাকবে নারে আসবে অমাবস্যা,
চিরদিন তো থাকবে নারে রঙ্গের ভালোবাসা।
দিন দয়াল দাসে বলে, নদীর কূলে বসিয়া,
পার হইব পার হইব বলে, দিনতো যায় মোর গইয়া।"[১১]

ব্যাখা - এই গানটি ধামাইল গানের 'নাম' পর্যায়ের গান। অধিবাসের দিন আসর পর্যায়ের পর ক্রম অনুসারে পরপর নাম পর্যায়ের এই গানগুলি গাওয়া হয়। এই গানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা হয় এই সংসারের মায়া থেকে মুক্ত করার জন্য।

এই গানে বলা হয়েছে যে সংসারের আসা, সংসারের মায়া পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ নামে মনোনিবেশ করতে হবে। ১৬ নাম ৩২ অক্ষর জপ করা ছাড়া এই ভবসাগরের মায়া পরিত্যাগ করা যায় না। গানটিতে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের মন্ত্র না নিয়ে আগে বিবাহ করা হয়েছে। যেই সুন্দরী নারী রূপে মোহিত হয়ে মন্ত্র না নিয়েই আগে বিবাহ করা হয়েছে সেই নারীকেই ভবে ফেলে যেতে হবে। বলা হয়েছে যে আকাশে সব সময় পূর্ণিমার চাঁদ থাকবেনা, পূর্ণিমার পর প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী অমাবস্যা আসবেই। গানের এই পংক্তিটির মাধ্যমে দুটি অর্থের প্রকাশ পাচ্ছে। অন্য অর্থটি হচ্ছে মানুষের রূপ, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ কোন কিছুই স্থায়ী নয় মহাকালের নিয়মে এই সবকিছুর মায়া ছেড়ে সবাইকে একদিন যেতে হবে। তাই কৃষ্ণ নামের দ্বারা এই সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ না করলে এই ভব সাগর পার করা যাবে না। চিরদিন যে রঙের ভালোবাসা থাকে না, এই কথাটিও গানে গানে বলা হয়েছে। নদীর তীরে বসে আছেন দীনদয়াল দাস। তিনি নদী পার হবার আশায় বসে আছেন এবং সেই প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই পংক্তিটির মাধ্যমে দুটি অর্থ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অর্থে নদীর কূল বলতে এখানে জীবনের অন্তিম লগ্নকে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু পার হতে তিনি পারছেন না এবং তা করতে করতে দিন চলে যাচ্ছে। এই গানটিতে আমরা একজনের নাম তাই তিনি হলেন দীনদয়াল দাস। এই নামটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে এই গানটি উনারই রচনা।

এই গানটিতে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হই। নাম ছাড়া যে মুক্তির আর কোন উপায় নেই আজকের জনজীবনকে এই বার্তাই গানটি দেয়। বিয়ের সময় আজও এই গানটি ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করে গাওয়া হয়। আজও নামকীর্তনের সমাবেশ দেখা যায়। জনজীবনে এই নাম জাতীয় গান গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই সংগীতের শাখাগুলোর মধ্যে লোকসংগীত হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, প্রাচীন ও সাধারণ একটি ধরন। বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের খুবই কদর রয়েছে। লোকসংগীত বলতে সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে উচ্চারিত প্রথানুগ সংগীতকে বোঝায়। এটি বহুকাল ধরেই আমাদের প্রজন্ম পরম্পরায় গাওয়া হয়ে আসছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষের মুখে এই গান এখনো বেঁচে আছে। এটি সাধারণত মৌলিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। বিভিন্ন উপলক্ষে আমাদের বাউলেরা মর্মস্পর্শী আবেগ দিয়ে লোকসংগীত গেয়ে থাকেন। প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেই এ সংগীত গাওয়া হয়। লোকসংগীতগুলো আধ্যাত্মিক গ্রামীণ ও অপার্থিব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গাওয়া হয়। এটি গ্রাম্যজীবনের এক বিস্ময়কর বর্ণনা।

দেশপ্রেমের আবেগ বিজড়িত লোকসংগীত গুলো অতীতের দুঃখ বিজড়িত কাহিনী বর্ণনা করে শ্রোতার চোখে অশ্রু নিয়ে আসে। অবশ্য লোকসঙ্গীতে আনন্দভরা বিষয়বস্তু ও যুগপতভাবে বর্তমান। এখনও গ্রামের অনেক লোক সূর্যাস্তের পরে তাদের নিজেদের তৈরি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বারান্দায় বসে স্থানীয় শ্রোতাদের কাছে লোকসংগীত পরিবেশন করেন। আমাদের লোকসংগীতগুলো তাদের ভিন্নধর্মী নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের উল্লেখযোগ্য অহংকার এ পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার প্রবাহের বাংলার মাটির শিল্প, তার একান্তই নিজস্ব সম্পদ এই সব গানগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এখনকার মানুষেরা আর এইসব লোকগানে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে এই সব অমূল্য সম্পদ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে। এই মূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য সচেতনতা ও সযত্ন প্রয়াস একান্তভাবেই অপরিহার্য।

Reference:

১. দাশ, নির্মল, লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব পরিক্রম, অক্ষর পাবলিকেশনস্, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃ. ২৯
২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তকবিপন, কলকাতা-৯, পৃ. ১১
৩. সরকার, পবিত্র, লোকভাষা লোকো সংস্কৃতি, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, চিরায়ত প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫
৪. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫৮

৫. ইসলাম, তুর, মাহারুল, লোকসংগীত এর বিচিত্র ধারা, পৃ. ১৯
৬. তথ্যদাতা – নিয়তি শীল, বয়স : ৬৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : কৈলাশহর, জেলা : ঊনকোটি, থানা : কৈলাশহর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪
৭. তদেব
৮. তদেব
৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৮০
১০. তথ্যদাতা – নিয়তি শীল, বয়স : ৬৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : কৈলাশহর, জেলা : ঊনকোটি, থানা : কৈলাশহর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪
১১. তদেব

Bibliography:
আশরাফ সিদ্দিকী : লোক-সাহিত্য (প্রথম খন্ড), সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্ডস, কলকাতা ৭০০০৬৭।
পঙ্কজ বিশ্বাস : লোকসংগীত স্বরূপ শোষণ ও প্রতিক্রিয়া।
মাহারুল ইসলাম তুর : লোকসংগীত এর বিচিত্র ধারা।
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।